ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১-২২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4201

বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস হিসেবে লোকসাহিত্য: উপযোগিতা ও সীমাবদ্ধতা

আবু তাইয়্যেব
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Folk literature, passed down orally in rural communities, includes songs, rhymes, ballads, tales, proverbs, riddles, dramas, and charms (mantras). They reflect the daily lives, economic struggles, joys, sorrows, and religious beliefs of the common people. A challenge in studying the history of early and medieval Bengal is the lack of reliable sources, as most existing documents emphasize political events, battles, and royal narratives, overlooking the rural populace. The unschooled rural people left no written records themselves and were largely absent from historical accounts preserved in court writings, coins, or inscriptions. Writing history without considering this vast rural population would result in an incomplete and fragmented understanding of the social dynamics of Bengal. The primary source for reconstructing the history of these people is contemporary literary material. However, as most written works were generated by court poets funded by the royalty, they largely ignored the experiences of the general populace. In contrast, the oral literature created by illiterate folk poets and transmitted orally from generation to generation provides valuable insights into the daily life and experiences of the rural population. Folk literature is generally neglected as a source in the study of history in Bangladesh and historians typically raise questions about its reliability. This paper examines the significance of folk literature as a tool for understanding the socio-cultural history of rural communities through a historical research approach and critically analyzes its reliability and limitations in reconstructing history.

Keywords: Folk Society, Culture, Historical Source, Rural Bengal.

ভূমিকা

লোকসাহিত্য হচ্ছে লোকমানসের সামগ্রিক জীবনবোধ, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা, কল্পনাপ্রবণতা এবং ভাবালুতার এক বর্ণিল আলোচ্ছটা। লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত বা মানসগত রূপই লোকসাহিত্য। কোনো একটি ভূ-খণ্ডের

জনগোষ্ঠীর চিরায়ত সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধান, স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরার অন্যতম উপকরণ হলো লোকসাহিত্য যা লোকস্মৃতিপটে সংরক্ষিত এবং লোকমুখে নিত্য বহমান। তাই ফোকলোরবিদ, ইতিহাসবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, জাতিতত্ত্ববিদ, ভাষাবিজ্ঞানী অথবা মনস্তত্ত্ববিদ – সকলের কাছেই সমাদৃত ফোকলোর বিদ্যাশাখার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই লোকসাহিত্য।

একটি অঞ্চলের মানুষের জীবনধারণের মান, ধর্ম বিশ্বাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবলম্বন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, মনোজগতসহ সামগ্রিক জীবনপ্রণালীতে প্রচ্ছন্নভাবে নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকায় অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, পানির উৎস প্রভৃতি।[১] বাংলার[২] ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, বরং এ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবকিছুতেই এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব দৃশ্যমান। বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা নদ-নদীর আধিক্য, জলরাশির প্রাচুর্য, ভূমির উর্বরতা, উত্তরের সুউচ্চ হিমালয়, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, বৃষ্টিপাতের প্রাবল্য প্রভৃতি যেমন বাংলা ব-দ্বীপের ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তেমনি এখানকার অধিবাসীদের স্বভাব-প্রকৃতি ও স্বকীয় সত্তা নিরূপণ করেছে হাজার বছর ধরে।[৩] বাংলার এই নদী-নালা, আর্দ্র কোমল জলবায়ু এবং উর্বর পললভূমি বাঙালির জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষিকাজকে সহজতর করার ফলে মরু ও মেরুবাসীর তুলনায় শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয়, অলস এবং ভাবাতুর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বাঙালি জাতির মানসে প্রোথিত হয় যা তাদের কবিসত্তাকে জাগ্রত করেছে। গ্রামীণ বাংলার অক্ষরজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠী মৌখিকভাবে সাহিত্য রচনা করতো এবং লোকমুখেই তার প্রচার হতো। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় সৃষ্ট গ্রাম্য কবিদের শিল্পবোধের ফসল এবং তার নান্দনিক প্রকাশই হলো বাংলা লোকসাহিত্য যার সমৃদ্ধ শাখা-প্রশাখাগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে বাংলার গ্রামীণ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার, ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির পাশাপাশি তাদের জীবন সংগ্রাম এবং নদীমাতৃক বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রাণ-প্রকৃতির চিরায়ত রূপ। এটি হচ্ছে 'জনপদের হৃদকলরব'[৪] যেখানে আবহমান বাংলার জনমানসের মনস্তত্ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়, আন্তঃসম্প্রদায়গত সমন্বয় ও 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' এর নিদর্শনসমূহ দৃশ্যমান হয়।

বাংলা ভূখণ্ড এবং বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধানের অন্যতম নিদর্শন লোকসাহিত্য চর্চার কৌতূহল অনেকটা সাম্প্রতিককালের এবং এর প্রেরণা এসেছে ইউরোপীয় জ্ঞানজগত থেকে। অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপীয় রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ জনগণের অভ্যাস-অনুভূতি সম্যকভাবে অনুধাবন করে সেগুলোকে আরও সুচারুরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার অভিপ্রায়ে ফোকলোর সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৫] তাদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলেন ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট (প্রুশিয়া), ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট (রাশিয়া), চতুর্দশ লুই (ফ্রান্স), প্রথম ম্যাক্সমিলান (ব্যাভারিয়া), প্রিন্স ভন মেটারনিক (অস্ট্রিয়া) সহ আরও কতিপয় শাসক।[৬] অনুরূপভাবে কতিপয় ইংরেজ প্রশাসক-গবেষক-

ধর্মপ্রচারক বাংলা লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং তা বহির্বিশ্বে প্রকাশের মাধ্যমে পণ্ডিতমহলের দৃষ্টি আকর্ষণের সূত্রপাত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিশনারি সদস্য রেভারেন্ড জেমস লং, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন,[৭] হেনরি ব্রেভারিজ, উইলিয়াম হান্টার,[৮] এডওয়ার্ড ডাল্টন,[৯] হার্বার্ট রিজলি, জেমস ওয়াইজ,[১০] উইলিয়াম ক্রুক[১১] সহ আরও কয়েকজন, যারা এতদঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং ব্রিটিশ প্রভুত্ব এবং সাম্রাজ্যকে স্থায়ী ভিত্তি প্রদানের সুদূরপ্রসারী রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে এখানকার মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনে প্রয়াসী ছিলেন। অফিসিয়াল রেকর্ডের অংশ হিসেবে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ তারা সংগ্রহ এবং নথিভুক্ত করতে শুরু করেন। স্বয়ং সরকারি ছাপাখানা হতে এগুলো মুদ্রিত হতো।[১২] ভারতবিদ্যার (Indological Studies) সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি এবং থিওসোফিক্যাল সোসাইটি এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের শেষভাগজুড়ে এসকল ইংরেজ প্রশাসক-গবেষক-ধর্মপ্রচারকগণ তাদের গবেষণা প্রবন্ধ, গ্রন্থরাজি এবং রিপোর্টগুলোতে তুলে ধরেছেন বাংলা লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব এবং লোকসমাজের নানাবিধ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য।[১৩] এর পরেই ব্রিটিশদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কতিপয় পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি পণ্ডিত এবং কবি-সাহিত্যিক এসব লোককথা-কাহিনি-সাহিত্যকে গ্রামীণ জনপদ থেকে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে ঔপনিবেশিক শহুরে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হন।[১৪]

ইতিহাসবিদদের মধ্যে আবদুল করিম, আবদুর রহিম, সুখময় মুখোপাধ্যায় সহ কেউ কেউ ইতিহাস গবেষণায় রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা রাজবংশকেন্দ্রিক সমসাময়িক প্রচলিত কিংবদন্তি বা লোকমুখে প্রচারিত উপ-কথাকে নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নসাপেক্ষে ব্যবহার করেছেন। নীহাররঞ্জন রায়ও মৌখিকভাবে প্রচারিত লোকসাহিত্যগুলোতে জনসাধারণ ও প্রাকৃতজনের জীবনাচারের বিষয়টিকে স্বীকার করেছেন এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থন সাপেক্ষে গ্রহণের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।[১৫] ইতিহাস গবেষক আকবর আলি খান তাঁর গ্রন্থে (১৯৯৬) বাঙালি জাতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি উৎস হিসেবে লোকসাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন।[১৬] কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বর্তমান ইতিহাস গবেষণায় বিশেষত গ্রামীণ সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চায় লোকসাহিত্য এখনও আমেরিকা,[১৭] ইউরোপসহ[১৮] পশ্চিমা ইতিহাসচর্চার ধারার ন্যায় অন্যতম সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়নি।

আলোচ্য প্রবন্ধে ইতিহাসতত্ত্বের নিরিখে বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনপ্রণালীর একটি আকর মৌখিক উপাদান হিসেবে লোকসাহিত্যে দৃষ্টিপাত এবং এর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলোও তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। যেহেতু লোকসাহিত্য লোকসমাজের আবহমান প্রক্রিয়ার সৃষ্টি এবং এর উদ্ভব ও বিকাশের কোনো সুনির্দিষ্ট সময়কাল জানা যায় না, সংগ্রাহক কর্তৃক সংগ্রহের

কালটাই জানা যায় মাত্র, সঙ্গত কারণে অত্র গবেষণায় কোনো সময়সীমা ব্যবহার করা হয়নি। এটিকে বর্তমান গবেষণা এবং লোকসাহিত্য- উভয়েরই অন্যতম সীমাবদ্ধতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

লোকসাহিত্যের পরিচয়

প্রকাশ মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে ফোকলোর বিদ্যাশাখাকে দু'টি শাখাতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে যথা, মূর্তিমান সংস্কৃতি (Material culture) এবং বাক সংস্কৃতি (Formalised culture)।[১৯] বস্তুগত লোকজ উপাদান তথা লোকশিল্প হচ্ছে প্রথম প্রকরণের অংশ এবং দ্বিতীয় প্রকরণটিই মূলত লোকসাহিত্য।

গ্রামীণ জনপদস্থ নিরক্ষর সাধারণ জনগোষ্ঠীর সৃজনধর্মী, কল্পনাপ্রবণ এবং যাপিত জীবনের বাস্তবিক অভিজ্ঞতার কাব্যিক ও গদ্যধর্মী বহিঃপ্রকাশই হলো লোকসাহিত্য। আমেরিকান ফোকলোরবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস লি আটলি লোকসাহিত্যের পরিচয়ে বলেছেন 'literature transmitted orally'[২০] অর্থাৎ মৌখিক মাধ্যমে প্রবহমানতা এ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকসাহিত্য কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল মনের বহিঃপ্রকাশ হলেও গ্রাম্য লোকমানসের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এর গভীরে প্রোথিত। লোকসাহিত্যের অধিকাংশ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি হলেও এগুলোর মূলভাবে সামগ্রিক জনমানসের মনস্তত্ত্ব, চিন্তাভাবনা এবং ব্যবহারিক জীবনের ছায়াপাত হওয়ায় তা লোকসম্পদে পরিণত হয়েছে। তাই লোকসাহিত্যে ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে যূথবদ্ধ সামাজিকগোষ্ঠীর ভূমিকা মুখ্য।

ফোকলোরবিদ মযহারুল ইসলাম এর মতে, "যে সাহিত্য সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে, এখনো প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, সেগুলোই লোকসাহিত্য।"[২১] আবদুল হাফিজ বলেন, "... এদেশের নিরক্ষর এবং গাঁও-গেরামে বসবাসকারী লোক-সাধারণের মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত সাহিত্য, এ জিনিস লেখার জন্য নয়।"[২২] লোকসাহিত্য গবেষক আবদুল হাফিজ যথার্থই বলেছেন কেননা শিক্ষিত কবি-সাহিত্যক কর্তৃক শহুরে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পাঠকের জন্য রচিত, নন্দনতত্ত্বে পরিপুষ্ট, ছাপাখানার যন্ত্র থেকে ভূমিষ্ঠ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাথে লোকসাহিত্যের ফারাক বিস্তর। লোকসমাজে এর উৎপত্তি এবং লোকমুখেই এটির প্রসার ও প্রবহমানতা। লোকসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র।

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ বাঙালি সমাজের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং লিখিত জ্ঞানচর্চার প্রসার ছিল অত্যন্ত সীমিত। সমাজের সিংহভাগ মানুষই পড়তে কিংবা লিখতে জানতেন না। ব্রিটিশ শাসনামলে সংঘটিত ১৮৮১ সালের দ্বিতীয় আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা, ছোট নাগপুরের করদ রাজ্যগুলো ব্যতীত তৎকালীন বাংলা প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৯৫.৫২% মানুষ লিখতে বা পড়তে জানতেন না।[২৩] এমনকি তারও প্রায় ১৩০ বছর পর ২০১১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত

পঞ্চম জনশুমারি ও গৃহগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬.০৮% মানুষ নিরক্ষর[২৪] এবং ২০২২ সালের ষষ্ঠ জনশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা প্রায় ২৯.৮১%।[২৫] উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটি স্পষ্ট যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের অক্ষরজ্ঞান নেই। সুতরাং এর আলোকে আদি বা মধ্যযুগের বাংলা ভূখণ্ডের কৃষিনির্ভর সমাজের সিংহভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অক্ষরজ্ঞানহীনতার অনুকল্প করলে তাতে ইতিহাস শাস্ত্রের প্রথা বিরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকবে। গ্রামীণ সমাজের প্রতিভাবান নিরক্ষর লোক-কবিগণ তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, কল্পনাপ্রবণতা, সুখ-দুঃখ এবং কামনা-বাসনা সরল-সহজ ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতা, ছড়া, সংগীত, লোককাহিনিসহ আরও অন্যান্য শাখায়। সেখানে উঠে এসছে বাংলার গ্রামীণ সমাজের চিরায়ত রূপ; প্রকৃতি ও পরিবেশ; সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, আচার, প্রথা প্রভৃতি। এভাবেই বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধতর রূপ হিসেবে লোকসাহিত্য পরিগ্রহ করেছে। বাঙালি জাতিসত্ত্বার উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গেই বাংলা লোকসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে।[২৬]

লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ

ফোকলোরবিদগণ বাংলা লোকসাহিত্যকে লোকসংগীত, ছড়া, লোককাহিনি, গীতিকা, লোকনাট্য, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন – এই আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করে থাকেন। বর্ণনাগত দিক থেকে লোককাহিনি গদ্যধর্মী এবং লোকসংগীত, গীতিকা, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র ও ধাঁধা ছন্দবদ্ধ পদ্যধর্মী এবং লোকনাট্য ও প্রবাদ প্রবচনে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত উল্লেখ্য, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের লিখিত ধারার বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যধর্মী এবং সেখানে গদ্যের কোনো নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। এদিক থেকে লোকসাহিত্য অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবহমান বাংলার মৌখিক সংস্কৃতির নিদর্শন লোকসাহিত্যে পদ্যের পাশাপাশি গদ্যাশ্রয়ী রচনারও (লোককাহিনি) প্রচলন ছিল।[২৭]

লোকসাহিত্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন

লোকসাহিত্যের আটটি শাখাতে বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনাচারের বিভিন্ন উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে সেই দিকগুলো স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হলো:

লোকসংগীত

লোকসংগীত হচ্ছে রূপগত ও বিষয়গত দিক থেকে বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধতম সৃষ্টি এবং পরিবেশনাগত লোকসংস্কৃতির অংশ। মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ– লোকসংস্কৃতির এই প্রধান দু'টি বিভাজনের সমন্বয়ে মিশ্র সৃষ্টি লোকসংগীত, কেননা সংগীতের বাণী বিমূর্ত হলেও তার অন্যতম অনুষঙ্গ লোকবাদ্যযন্ত্রগুলো মূর্ত সংস্কৃতির উপকরণ।[২৮] বাংলাদেশের

প্রখ্যাত লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জামান আব্বাসী বলেন, "লোকের মুখে মুখে যে গান ঘুরে বেড়ায়, যার লিখিত রূপ নেই, যা বংশ পরম্পরায় গীত হয়ে এসেছে, গীতলেখক বা সুরকারের পরিচয় যেখানে অবলুপ্ত, যার গায়কীতে আছে এমন একটি বিশেষ রূপ যা তার নিজস্ব, তাকেই লোকসঙ্গীত বলা যায়।"[২৯] প্রাথমিকভাবে লোকসংগীতকে ধর্মীয় প্রেরণাজাত লোকসংগীত এবং ধর্মীয় প্রেরণা-নিরপেক্ষ লোকসংগীত – এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। লোকসংগীতে আঞ্চলিকতার প্রভাব প্রবলভাবে লক্ষণীয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে অঞ্চলভেদে লোকসংগীতেরও মূল প্রতিপাদ্য, সুর এবং ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। লোকসংগীতগুলোর মধ্যে বাউল গান, ভাটিয়ালী গান, ভাওয়াইয়া গান, গম্ভীরা গান, মাইজভান্ডারি গান, জারি গান, সারি গান, গাজন গান, অষ্টক গান, ভাদু গান, চটকা গান, মাগনের গান, ধান কাটার গান, ছাদ পিটানোর গান, আলকাপ গান, করচা গান, মানিক পিরের গান, মেয়েলি গীত, বারমাসী গীত উল্লেখযোগ্য।

লোকসংগীতের সুরের ভাঁজে ফুটে ওঠে কোনো একটি অঞ্চলের লোকসমাজের জীবনঘনিষ্ঠ মননের এক সামগ্রিক চিত্র। এখানে একটি জাতির সৃজনশীলতা, রুচিবোধ, বিনোদন ও মনোরঞ্জনের বিশিষ্ট দিকের পাশাপাশি জীবনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস-সংস্কার, সামাজিক অসঙ্গতি, দুঃখ-দুর্দশার চিত্রও ধরা পড়ে।

কুকিলা ডাকিস নারে আর
আমার বসোনভের বাহার
নাবালোক কালে মইলো পতি
যার পোড়া কপাল।
আমার পতি মারা জাল
আমার বনদুয় পাইচে ছল
পতির জ্বালা মোর বেষম জ্বালা
জ্বালায় ননোদী।[৩০]

ভাওয়াইয়া গানের উপর্যুক্ত কলিগুচ্ছে গ্রামীণ সমাজের চিরাচরিত কতিপয় চিত্র যেমন নারীজীবনের আক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক কলহ, নারীর প্রতি অবজ্ঞার বিষয়টি পরিদৃশ্যমান। পিতৃগৃহ এবং পতিগৃহ উভয় স্থানে নারীরা অবহেলিত ছিল। যেমন রংপুরে প্রচলিত একটি বিয়ের গীতে আছে:

যার না ঘরে আচে কুমারী মাইয়্যা রে,
তার বাবার চৌকত নাইয়ো নিন্দ রে।[৩১]

ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি সারি গানের অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

রাধিকা যমুনায় যায় গো হেলিয়া ঢলিয়া
পাছে পাছে কানু চলে মুরলী বাজায়া ॥
চলতে গেলে বাজে রাধার চরণে মেকুর

তার মধ্যে কালা মেঘে আসমান করলো ঘোর ॥
কেমনে ভরে জল রাধা মেঘে হইল আন্ধি
মাডির কলসি ভাইঙ্গা গেল হাতে রইলো কান্ধি ॥[৩২]

উপর্যুক্ত গানে নদী এবং নদীকেন্দ্রিক জীবনপ্রণালী, সুরযন্ত্র হিসেবে মুরলী নামক বাঁশীর ব্যবহার, বঙ্গ-ললনার পায়ের অলংকাররূপে মেকুর, মৃৎপাত্রের ব্যবহার এবং আকস্মিকভাবে প্রতিকূল আবহাওয়ার আগমন প্রভৃতি যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র নদীমাতৃক বাংলার গ্রামীণ সমাজজীবনের একটি পূর্ণ চিত্র। অনুরূপভাবে বাউল, মারফতী, মুর্শিদী প্রভৃতি গানে লোকসমাজের বিশেষ শ্রেণির মানুষদের দর্শন, চিন্তাভাবনার রূপায়ণ লক্ষ করা যায়।

লোককাহিনি

বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধতম ধারা হচ্ছে লোককাহিনি। আধুনিক কথাসাহিত্যের পূর্বসুরী ও পথনির্দেশক হিসেবে লোককাহিনিকে বিবেচনা করা হয়। লোকমানসের আবেগ-অনুভূতি, কল্পনাপ্রবণ মন, ভাবালুতার এক রসধর্মী আলেখ্য লোককাহিনি। লোকমনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্ট এবং কালানুক্রম ধরে বহমান এসব কাহিনিতে পরোক্ষভাবে চিত্রিত হয়েছে আবহমান গ্রামীণ বাঙালি সমাজের বাস্তবিক জীবনের অভিজ্ঞতাবোধ, সুখ-দুঃখ, টিকে থাকার সংগ্রাম, দারিদ্র্য, প্রকৃতির কাছে অসহায়ত্ব, সামাজিক নানা অসঙ্গতি, ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার। বাংলা লোককাহিনি সংগ্রহে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন রেভারেন্ড লাল বিহারী দে, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, স্যার আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ। বাংলা বহুলপরিচিত লোককাহিনির মধ্যে রয়েছে ঠাকুরমার ঝুলি, কাক ও কলস, ব্রাহ্মণ ও বাঘ, সোনার কাঠি রুপার কাঠি, নীলকমল ও লালকমল, শুক ও সারি, হিরামন তোতার গল্প, কলাবতী রাজকন্যা, সাতভাই চম্পা প্রভৃতি। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় মুসলিম শাসনামল শুরু হওয়ার পর এখানে মুসলিমদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিম এশিয়ার বিশেষত আরব অঞ্চল থেকে মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় আরবি ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাসের আগমন লক্ষ করা যায়। একই পন্থায় বাংলায় বিভিন্ন আরব্য লোককাহিনিরও আগমন ঘটে। তবে বাঙালি লোকসমাজে এসে আরব্য কাহিনিগুলোতে বিশেষ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে। কাহিনির মূলে আরব্য উপাখ্যানের প্রাধান্য থাকলেও বিবরণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন ভৌগোলিক বর্ণনা, সমাজ চিত্র, আচার-আচরণে বাংলার চিরাচরিত রূপের অনুপ্রবেশ প্রবলভাবে লক্ষণীয়। এভাবে আরবীয় ও বাঙালি উপকরণের মিশ্রণে একটি সংমিশ্রিত ও সমন্বয়বাদী লোকসাহিত্যধারার উদ্ভব ঘটে। বাংলা লোককাহিনিগুলোর ঘটনা, পারিপার্শ্বিকতা ও চরিত্র-চিত্রণ বিশ্লেষণ করলে ফুটে ওঠে চিরায়ত লোকসমাজের দারিদ্র্য-দুর্দশা, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য, বাল্যবিবাহ, দুর্বলের উপর সবলের নিষ্পেষণ, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীন-বিদ্বেষ, দাম্পত্য-প্রেম, অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস প্রভৃতি অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের নানা জীবনালেখ্য।[৩৩]

লোকগীতিকা

গীতিকা হচ্ছে বর্ণনাশ্রয়ী দীর্ঘ রচনা এবং কাহিনিধর্মী লোকসংগীত। লোকসাহিত্যের তুলনামূলক নবীন ধারা যার উদ্ভবকাল হিসেবে ধরা হয় মধ্যযুগকে। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে গীতিকাগুলো বিকশিত হয়েছে। কৃষিপ্রধান বাঙালি গ্রামীণ জনসমাজের মানসগত ভাব নিবিড়ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে গীতিকায়।[৩৪] বাংলা লোকগীতিকার প্রধান দু'টি ধারা হলো পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও নাথ গীতিকা। ময়মনসিংহ গীতিকা পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসীম উদ্‌দীন প্রমুখের সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহের উদ্যোগ নেন এবং পরবর্তীকালে এগুলোকে সম্পাদনা করে *মৈমেনসিং গীতিকা* (১৯২৩) ও তিন খণ্ডে *পূর্ববঙ্গ গীতিকা* (১৯২৬-১৯৩২) নামে প্রকাশ করেন। এগুলোতে মোট ৫৪টি গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে।[৩৫] গীতিকাগুলোর মূল উপজীব্য ছিল নর-নারীর প্রেম। ময়মনসিংহ থেকে সংগ্রহকৃত গীতিকাগুলোতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ, ধর্ম, রাজনৈতিক আবহ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক চিত্রায়িত হয়েছে। কতিপয় গীতিকার বন্দনা অংশে একই সঙ্গে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের স্তুতিমূলক চরণ পরিলক্ষিত হয়। লোকসাহিত্য গবেষক আবদুল হাফিজ বিষয়টিকে 'বহুধর্মে বিশ্বাসী' নিরক্ষর সাধারণ জনসমাজের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চেতনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] উদাহরণস্বরূপ মহুয়া লোকগীতিকার বন্দনা অংশে আছে:

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় হয় রে ভানু চৌদিকে পশর ॥
... ...
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান ॥[৩৭]

গীতিকাগুলোতে মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন শ্রেণি ও বৃত্তির নাম পরিলক্ষিত হয়। যেমন: রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজী, কারকুন, সওদাগর, পির-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী, ধোপা, নাপিত, ধাত্রী, ফকির প্রভৃতি।[৩৮] এছাড়াও তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীদের অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা, দুর্দমনীয়তা ও প্রতিবাদী চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকাগুলোতে বাঙালি লোকসমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবলভাবে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক আকবর আলি খান বলেন: "The robust individualism of Bengalis also found its expression in folk literature, especially in Mymensingh ballads."[৩৯]

লোকছড়া

ছড়া হচ্ছে লোকমুখে রচিত গ্রাম্য কবিতা। লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম এই প্রকরণে পরিলক্ষিত হয় গ্রামীণ জীবনের সংযোগ এবং প্রতিফলিত হয় চিরায়ত বাঙালি সমাজের

কাব্যপ্রতিভা, অবসর-বিনোদনের নানা অনুষঙ্গ। ছড়াতে সুর থাকলেও তা লোকসংগীত নয়। বাংলা ছড়াগুলো সাধারণভাবে শিশুতোষ হলেও এর আবেদন সর্বজনীন। শিশুর মনোরঞ্জক হিসেবে লোককবিগণ সমাজের প্রচলিত এবং পরিচিত বিষয়গুলোকে চিত্তাকর্ষকরূপে ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন। ছেলে ভুলানো বা শিশুতোষমূলক ছড়া ছাড়াও রয়েছে খেলাধুলার ছড়া; পারিবারিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছড়া; আচার-অনুষ্ঠানের ছড়া; ঐন্দ্রজালিক ছড়া এবং নীতি ও শিক্ষামূলক ছড়া প্রভৃতি।[৪০] 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদে এলো বান' ছড়াটি সুদীর্ঘকাল থেকে অদ্যবধি শিশুদের মধ্যে একটি বহুল প্রচারিত ছড়ারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লোকসমাজ থেকে সংগ্রহকৃত লোকছড়ার উপর রচিত প্রবন্ধ 'মেয়েলি ছড়া' ১৩০১ বঙ্গাব্দে *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেখানে এই ছড়ার উল্লেখ রয়েছে। ছড়াটিতে বাংলার বর্ষা ঋতুর একটি সরল বর্ণনা ও শিব ঠাকুর এর বিয়ের বিষয়টি উঠে এসছে। তবে উক্ত ছড়ার শিব ঠাকুর এবং পৌরাণিক শিব অভিন্ন নাকি ভিন্ন তা নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র,[৪১] আশুতোষ ভট্টাচার্য[৪২] এবং মুহম্মদ এনামুল হকের[৪৩] মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। অপর একটি ছড়া:

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদঙ্গ ঝাঁঝর বাজে ॥[৪৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যানুযায়ী উক্ত ছড়ায় অভিজাত পরিবারের বিবাহযাত্রার দিকটি বর্ণিত হয়েছে। যদিও আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে[৪৫] মতে প্রাচীন বাংলার রাজারাজড়াদের যুদ্ধযাত্রার অগ্রণী যোদ্ধা ছিল বাংলার দুটি অনার্য জাতি ডোম ও বাগদি এবং উপর্যুক্ত ছড়ায় ডোম ও বাগদিদের যুদ্ধযাত্রার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। লোকছড়ায় অনেক অবাস্তব এবং অসংলগ্ন শব্দসমষ্টিও পরিলক্ষিত হয়, তা সত্ত্বেও এই ছড়াগুলোতে লোকসমাজের অভিজ্ঞতা, কল্পনা, ঐতিহ্য, কাব্যপ্রতিভা এবং শিশু-মনোবিজ্ঞানের কতিপয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

লোকনাট্য

চিরায়তকাল ধরে যেসব মৌখিক নাটক নৃত্যগীত সহযোগে দেশজ রীতির অভিনয়ের মাধ্যমে লৌকিক উৎসবকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই কোনো লৌকিক উপাখ্যানকে উপজীব্য করে অভিনীত হয়ে আসছে এবং আনন্দরস সঞ্চার করছে তাই লোকনাট্য।[৪৬] লোকনাট্যে নৃত্য, গীত এবং অভিনয়ের এক অপূর্ব সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়। লৌকিক, পৌরাণিক, কল্পনাশ্রয়ী, ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিকসহ বিচিত্র বিষয়ে লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নানা আঙ্গিক ফুটে ওঠে লোকনাট্যে।[৪৭] এর প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত সরল এবং পরিবেশকদের পোশাক-পরিচ্ছদ থাকে চাকচিক্য বিবর্জিত। বাংলা লোকনাট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অষ্টক, আলকাপ, গম্ভীরা, ঘাটু, কবিগান, জাগগান, ভাসান যাত্রা, পালাগান, পালাটিয়া, মেয়েলি গীতিনাট্য

প্রভৃতি। গম্ভীরা গান আদিতে শিবপূজা উপলক্ষ্যে একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পরিবেশন করা হত এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গের মালদহে এটি পরিলক্ষিত হয়।[৪৮] বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে তা ধর্মনিরপেক্ষ ও বিনোদনমূলক পরিবেশনা হিসেবেই অধিক সমাদৃত। এখানে হাস্যরসাত্মকভাবে সমাজ, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রাম্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি স্থান পায়।[৪৯] আলকাপ ও ঘাটুগানে নর-নারীর প্রেম, মিলন, বিরহ প্রভৃতির বিষয়াধিক্য পরিলক্ষিত হয়। রাজশাহী অঞ্চলের একটি আলকাপ গান নিম্নরূপঃ

রাধিকে রানু, কি জানো জাদু প্রেমের ভুবনে,
যৈবুন আগুন দাউ দাউ করে পিরিত অঙ্গনে।
ধুয়া তোর মাস্তুলে সপ্ত পালে/ রঙধনু রঙ উজান চলে,
মনের গঙ্গায় ঢেউ উথলে/ হাইল ধরিবে কুনজনে।
...
স্বপুনে তোর সুরত চুমি/ তোর পিরিতের দাগী,
যৈবুন ক্ষয় হৈল রে রাধু/ তোরই কারণে॥[৫০]

লোকনাট্যে বাংলার আবহমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচ্ছন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। অবসর বিনোদনের মাধ্যম, বিভিন্ন লৌকিক উৎসব, বেঁচে থাকার লড়াই, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, মিলন-বিরহ, রসাত্মবোধ পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি নাট্যগীত পরিবেশনার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় বিশেষ সামাজিক ও পেশাগত শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

লোকমন্ত্র

মৌখিক লোক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রাচীন প্রকরণ হলো মন্ত্র। আদিম লোকসমাজের ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস-সংস্কারের এক পাথুরে নিদর্শন হচ্ছে মন্ত্র। জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়াও এটি আদিম সমাজের ধর্মীয় জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার অনুরূপ বাংলার লোকায়ত সমাজের মধ্যেও মন্ত্র-তন্ত্রের প্রাবল্য ছিল। অতিপ্রাকৃত উপায়ে অদৃশ্য শক্তিকে বশীভূত করার অভিপ্রায়ে মন্ত্রপাঠ হতো। আদিভৌতিক ভীতিভাবনা থেকে মন্ত্রসাধনার সূচনা এবং প্রাচীন বাংলার লোকসমাজ এটিকে বেঁচে থাকার রক্ষাকবচ হিসেবে কল্পনা করত।[৫১] বাংলা অঞ্চলে মন্ত্রবিশ্বাসের পেছনে এখানকার ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষ প্রভাব ছিল। মূলত অনির্ণেয় অতীত থেকেই অর্থাৎ অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বসবাসের সময় থেকেই এখানে মন্ত্রে বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। সকল বস্তুর আত্মা আছে এই মতে বিশ্বাস বা 'সর্বপ্রাণবাদ'(Animism) হচ্ছে জাদুমন্ত্রের উৎস।[৫২] এখানকার আদিম সমাজ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পতিত ছিল। নদনদীর আধিক্যের ফলে বিভিন্ন প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল এখানকার অধিবাসীদের নিত্য সাথী। বাংলায় প্রচুর উপকূলীয় বনভূমি ছিল এবং বন-জঙ্গলের সাপ, বাঘসহ হিংস্র পশুর সাথে লড়াই করে

টিকে থাকতে হতো। আবার অনাবৃষ্টি ও খরার সময় ফসলী জমি চৌচির হয়ে যেত। এভাবে প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষ ছিল নিতান্তই অসহায়। এমতাবস্থায় দৈব ও অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করার পটভূমিতে মন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ফোকলোর গবেষক আর্চার টেলর মন্ত্রের সংজ্ঞায়নে বলেছেন: "…. the art of controlling nature by supernatural means."[৫৩]

লোকসাহিত্যের শাখাগুলোর মধ্যে মন্ত্র একটি ব্যতিক্রম এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট রচনা। কেননা এর আবির্ভাবের পেছনে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নিছক অবসর-বিনোদন অথবা রসবোধ মুখ্য অনুঘটক হিসেবে ছিল না। দৈত্য-দানব, জ্বীন-পরী ও অশরীরী আত্মার অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা; বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধ; ঝড়, বৃষ্টি খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে প্রতিকার; রোগবালাই থেকে মুক্তি; ধন-সম্পদ ও ফসল প্রাপ্তি; নর-নারী বশীকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে লোকায়ত সমাজের মধ্যে মন্ত্র-বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটে।[৫৪] যেমন বৃহত্তর যশোরে প্রচলিত ভূত-প্রেত তাড়ানোর একটি মন্ত্র হচ্ছে:

জিরা জিরা মহাজিরা, জিরা তো চলে,/জিরার শক্তিতে তবে ফলানি আয়ে।
জিরাতে রাম টলে,/নহে তো মশাল টলে।
হামার এই জিরা পড়ায়/উমকার উমকার অঙ্গে ভূত নাহি রহে।[৫৫]

অনুরূপ শরীর বন্ধনের একটি মন্ত্র হচ্ছে:

ভাসের কান্ধে মই অর্জন চাঁটের বাট।
আমি বাইরে গুরু পুত্তর লাগ ছাড়েন রে লাট॥
আমাকে দেখে লড়িস চড়িস বাড়াস তুণ্ড।
খাস তুই একেশ্বরের মুণ্ড॥
কার দোহাই মা মনসার দোহাই॥[৫৬]

মন্ত্রে প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়ত্ব এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস; রোগ বালাইয়ের লোকচিকিৎসার ধরন; মন্ত্রকেন্দ্রিক ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, পুরোহিত, বেদে-বেদেনি, শিরালী প্রভৃতি পেশার পরিচয়। তাই মন্ত্রগুলো বাঙালি লোকসমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্তিক ইতিহাস রচনার একটি অপরিহার্য উপাদান হওয়ার দাবি রাখে।

ধাঁধা

ধাঁধা হচ্ছে প্রশ্ন ও উত্তরের সমন্বয়ে সুসংহত লোকমানসিক ক্রীড়া এবং হাস্যরসাত্মক বিনোদনের মাধ্যম।[৫৭] ধাঁধায় একপক্ষ অপরপক্ষকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করত এবং প্রশ্নের মধ্যেই নিগূঢ়ভাবে থাকতো ধাঁধার উত্তর। বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করে বের করতে হতো এর উত্তর। প্রাচীন লোকসমাজে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত

হতো ধাঁধা । হেঁয়ালি ও প্রহেলিকা হচ্ছে ধাঁধার প্রতিরূপ। ফোকলোর গবেষকগণ ধাঁধার উদ্ভবের পেছনে কতিপয় নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। আর্য-পূর্ব আদিম কৌমভিত্তিক সমাজে মৃতদেহের সামনে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ভয় হিসেবে প্রেতাত্মাকে কল্পনা করত। তাই পরোক্ষভাবে ভাব বিনিময়ের জন্য যে পদ্ধতির অবতারণা হয়েছিল তা অনেকটা ধাঁধার অনুরূপ। বাংলা ধাঁধাগুলোতে প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছে চিরায়ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চিন্তার প্রগাঢ়তা, মানসিক দক্ষতা, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ, বাক্যালাপে রূপক ও উপমা ব্যবহারের প্রবণতা, রসবোধ প্রভৃতি। চার্লস ফ্রান্সিস পটার ধাঁধাকে 'গুচ্ছ চিন্তা'র ফল (Formulated thought)[৫৮] বলেছেন। একইভাবে বাঙালির চিন্তা এবং বুদ্ধির ইতিহাসে অত্র অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক নিদর্শন।

মহাভারত, *বেতালপঞ্চবিংশতি*, *ঋগ্বেদ*, *অথর্ববেদ*, *কথাসরিৎসাগর*, *বৌদ্ধ জাতকা* প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ধাঁধার উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত সোমদেব ভট্টের *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বিবাহের শর্তানুযায়ী রাজা বিনীতমতী, উদয়াবতী নাম্নী রাজকন্যাকে ধাঁধার উত্তর দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।[৫৯] বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ এবং মধ্যযুগের সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্যেও লোকধাঁধার সরব উপস্থিতি বিদ্যমান। তেমনিভাবে হাজার বছরের পুরোনো চর্যাপদের কবি কুক্কুরীপার একটি চর্যায় বর্ণিত ধাঁধা হচ্ছে:

দুহি দুহি পীঢ়া ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘর পণ সুন ভো বিআতি।
কানেট চোরে নিল অধরাতি॥[৬০]

এটি একটি তত্ত্ববিষয়ক ধাঁধা। প্রাচীনকালে চর্যাপদ থেকে শুরু করে ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে রচিত নাথ সাহিত্য পর্যন্ত এ জাতীয় তত্ত্বসম্পর্কিত ধাঁধার উল্লেখ লক্ষ করা যায় যেখানে গুরু তার শিষ্যের নিকট নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করতেন, যা বহিঃস্থ কেউ বুঝতে সক্ষম হত না।[৬১]

বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান, চৈত্র সংক্রান্তি, বৃষ্টি প্রার্থনা, শস্যবৃদ্ধি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসহ নানা উৎসব এবং সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই ধাঁধাগুলো।

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন লোকসমাজের অভিজ্ঞতার নির্যাস এবং বুদ্ধিদীপ্ত রচনা। একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বা ছন্দবদ্ধ দু'টি চরণ সম্বলিত প্রবাদ-প্রবচন অবয়বে ছোট হলেও এর মধ্যে থাকে গভীর অর্থবোধকতা ও পূর্ণাঙ্গ ভাবের সম্মিলন। কোনো জাতির লোকসমাজের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার ঐ জাতির মানসিকতা ও মননশীলতার অগ্রসরতার পরিচয়কে নির্দেশ করে।[৬২] প্রবাদ ও প্রবচন শব্দদ্বয় অনেকটা সমার্থক হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হলেও এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রবাদে ব্যঞ্জনার্থ বা রূপকার্থ থাকে,

পক্ষান্তরে প্রবচনে সরাসরি বাচ্যার্থ বা স্বাভাবিক অর্থ থাকে এবং কোনোপ্রকার নিহিতার্থ থাকে না। প্রবচনগুলো প্রবাদের তুলনায় সাধারণত বড় হয়ে থাকে। সরল প্রকাশভঙ্গি, আলংকারিক গুণ এবং ছন্দবদ্ধতার কারণে প্রবাদ-প্রবচনগুলো কালনিরবধি লোকসমাজের স্মৃতিপটে রক্ষিত হয়ে আসছে এবং যে কোনো আলোচনার অনুষঙ্গ হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অর্থদ্যোতকতার আঙ্গিক বিবেচনায় লোকসাহিত্যের এই শাখায় প্রতিফলিত হয় লোকজীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা, পরিণত বৌদ্ধিক অবস্থা, মনস্তত্ব, বদ্ধমূল ধারণা, নীতিবাক্য, সামাজিক রীতি ও সংস্কার, ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি। চিরায়ত লোকসমাজের নিরক্ষর জনসমষ্টির মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-উপদেশ ও জ্ঞানলাভের অন্যতম মাধ্যম ছিল প্রবাদ-প্রবচন।[৬৩] 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন', 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালা', 'দশের লাঠি একের বোঝা', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'অতি লোভে তাতী নষ্ট', 'চকচক করলেই সোনা হয় না', 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ', 'আপনি ভালো তো জগৎ ভালো'– এই প্রবাদগুলোতে উপদেশ ও শিক্ষামূলক ইঙ্গিত রয়েছে। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট', 'এক কড়ার মুরোদ নাই, ভাত মারবার গোঁসাই', 'হাতে নেই কড়াবট, প্রাণ করে ছটফট'– এই প্রবাদমালাতে চিরায়ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিদারুণ সামাজিক বাস্তবতা ও দারিদ্র্যের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। 'দুই সতীনে ঘর, খোদাই রক্ষা কর' – এখানে বাঙালি সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন এবং তাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহের একটি চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। এমনিভাবে প্রবাদ-প্রবচনে পরিলক্ষিত হয় সামাজিক অসঙ্গতি, দরিদ্রতার দৃশ্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নাম, খাদ্য-শস্য, প্রাণ-প্রকৃতির উল্লেখ, অদৃষ্টে বিশ্বাসসহ বাঙালি জনজীবনের বিচিত্র দিক। প্রবাদে ফুটে উঠে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কোনো একটি জনসমষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোজগতের খণ্ডচিত্র।[৬৪] বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রারম্ভিক দিককার অন্যতম পথিকৃৎ ব্রিটিশ ধর্মযাজক রেভারেন্ড জেমস লং প্রাগৈতিহাসিক সমাজের মানুষের সামাজিক অতীত পুনর্গঠনের সূত্র হিসেবে প্রবাদগুলোর গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন: "…. we gain a glimpse into pre-history time and proverbs may be the fossils to utilize the reconstruction of the long-buried past they give as the facts instead of fencies."[৬৫]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলা লোকসাহিত্যের শাখাগুলোতে খণ্ড-খণ্ড ভাবে বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতিনীতি, অবসর-বিনোদন, উৎসব, দুঃখ-কষ্ট, অসহায়ত্ব, মনস্তত্ত্ব, কুসংস্কার এবং জীবনসংগ্রামের নানাবিধ চিত্র উঠে এসেছে। লোকসাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাকে অনুরূপ বিশ্লেষণ করলে বাংলা এবং লোকায়ত গ্রামীণ বাঙালি জাতির সামগ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হবে, যা ইতিহাসের অন্যান্য প্রাথমিক সূত্রগুলোতে অনুল্লিখিত। এভাবে বাংলার চিরায়ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস পুনর্গঠনে উৎসের স্বল্পতা লাঘব করে

লোকসাহিত্য ইতিহাসবিদকে সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা রাখে।

উৎস হিসেবে বাংলা লোকসাহিত্যের উপযোগিতা

উৎপত্তিস্থলে লোকসাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও এখানে ব্যক্তির ভূমিকা গৌণ, কেননা এর লালনক্ষেত্র সমষ্টির জীবনচর্চায়। ব্যক্তির রচনায় যদি সমষ্টির কথা অনুরণিত হয় তবেই সেটা লোকমুখে চর্চিত হয়, আর যে রচনা অবসর-বিনোদন এবং লোকমনোরঞ্জনের অনুষঙ্গরূপে যুগপরম্পরায় নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে তা-ই লোকসংস্কৃতির বাচনিক নিদর্শন অর্থাৎ লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যে কোনো একটি লোকসমাজের সমষ্টিগত আবেগ, অনুভূতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ লালিত হয় এবং সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে ইতিহাস হচ্ছে প্রাপ্ত উৎসের আলোকে মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক এবং বস্তুনিরপেক্ষ বিবরণ। ইতিহাস গবেষণা এবং পুনর্গঠনে উৎস হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয়। ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে ঘটনার সমসাময়িক লিখিত দলিলপত্র, শিলালিপি, প্রত্নবস্তু, মুদ্রা, দিনলিপি, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ইত্যাদি। লোকসাহিত্য অথবা মৌখিক ঐতিহ্যকে ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাস গবেষক লোকসাহিত্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু ইতিহাস রচনায় লোকঐতিহ্য ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসশাস্ত্রের ন্যায়ই প্রবীণ।[৬৬] ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস *Histories* গ্রন্থে এবং গ্রিক ইতিহাসবিদ থুকিডিডিস তাঁর *History of the Peloponnesian War* গ্রন্থে অন্যান্য উৎসের সঙ্গে লোকমুখে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করেছেন।[৬৭] এমনকি অধুনা কালেও বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এবং সমালোচক স্যামুয়েল জনসন স্কটিশ ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে রচনায় মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৬৮] পশ্চিমা পণ্ডিতদের ইতিহাসচর্চায় লিখিত উৎস দীর্ঘদিন যাবত একক আধিপত্যশীল অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬৯] মূলত মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার, জ্ঞানের অঙ্গনে অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি (Empirically based method) ও হ্রাসবাদী (Reductionist) পদ্ধতির প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস রচনায় একসময়কার অন্যতম উপাদান মৌখিক উৎস আর্কাইভে সংরক্ষিত নথিপত্রের তুলনায় গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা হারাতে থাকে।[৭০] তবে সামাজিক ইতিহাস, মৌখিক ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস, অণু ইতিহাস (Microhistory) প্রভৃতি ইতিহাসের শাখা-প্রশাখার উদ্ভবের ফলে উৎস হিসেবে লোকসাহিত্য এবং ফোকলোর গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭০ এর দশক থেকে ইতিহাস ও ফোকলোরের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নবতর রূপ পরিগ্রহ করে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সময়টাকে 'পুনর্মিলনের যুগ' (Age of Rapprochement) হিসেবেও অভিহিত করা হয়।[৭১] রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং 'মহৎ ব্যক্তি'দের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস চর্চার প্রথাগত ধারার বাইরে কোনো একটি ভূখণ্ডের বৃহৎ জনসমাজ,

রাজকীয় কর্মকাণ্ডে যাদের প্রত্যক্ষ কোনো অংশগ্রহণ ছিল না এবং যার দরুণ ইতিহাসের মূলধারা উৎসগুলোতে যারা অনুপস্থিত তাদেরকে ইতিহাসের আলোচনায় উপজীব্য করার লক্ষ্যে 'History from below' নামক একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের সূচনা হয়। রিচার্ড চার্লস কব, জন এডওয়ার্ড ক্রিস্টোফার হিল, রোডনি হাওয়ার্ড হিল্টন, এরিক জে. হবসবম, রাফায়েল এলকাম স্যামুয়েল, এডওয়ার্ড থম্পসন প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই প্রচেষ্টায় অগ্রগামী ভূমিকায় ছিলেন এবং তাদের প্রচেষ্টার ফলে একাডেমিক অঙ্গনে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়।[৭২] আধুনিক যুগে মানুষের ইতিহাস চর্চায় কতিপয় নতুন নতুন ইতিহাসের শাখা-প্রশাখার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সাথে আন্তঃবিদ্যাশৃঙ্খলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয় এবং ফোকলোরবিদ্যা ও লোকসাহিত্য ইতিহাস গবেষণার অন্যতম সূত্র রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইতিহাস গবেষণায় পরিবর্তনের উক্ত ঢেউ বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায়ও পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক এবং সাম্রাজ্যিক ইতিহাসচর্চার গতানুগতিক ধারার বদলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিশেষ করে সাধারণ জনসমাজের ইতিহাস চর্চার ধারা সূচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের এই ইতিহাসচর্চায় অন্যান্য উৎসের মতো লোকসাহিত্যকে উৎস হিসেবে গুরুত্বারোপের প্রয়াস এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। লোকসাহিত্যে সাধারণ গ্রামীণ জনসমাজের মনস্তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, দুঃখ-দুর্দশা, জীবন-সংগ্রাম, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, অবসর-বিনোদনের বিষয়গুলো যতটা প্রাণবন্ত এবং প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে অন্যান্য সূত্রগুলোতে তেমনটা কমই লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় বহুত্ববাদ, সমন্বয়ধর্মীতা এবং হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও লোকধর্মের সংমিশ্রণে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে লৌকিক ধর্মবিশ্বাস (যেমন সত্যপির, গাজীপিরে ভক্তি, সুন্দরবন এলাকার বনবিবির পূজা) গড়ে ওঠার নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন লোককথায়।[৭৩] সাহিত্য ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে আবার কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানা সূত্র বিধৃত হয়েছে লোকসাহিত্যে।[৭৪] আদি সমাজের স্বাস্থ্যবিধি, লোকচিকিৎসা, কৃষিজ্ঞান, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়নের পদ্ধতি, আহারগ্রহণ সংক্রান্ত বিধান, পরিচ্ছন্নতার ধারণা প্রভৃতি লোকজ জ্ঞানের বিশদ তথ্য পাওয়া যায়।[৭৫] এ সাহিত্য বাঙালির জীবনধারণের সহজ ও লোকায়ত ধারার প্রজন্ম পরম্পরার স্বাক্ষর বহন করে।[৭৬] অধিকন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ফোকলোর বিদ্যাশাখা অনেকটা আধুনিক স্তরে উন্নীত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে লোকসাহিত্য সংগ্রহ, গবেষণা ও বিশ্লেষণে অনুসন্ধিৎসাবাদ, তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, মার্কসীয় পদ্ধতি, মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি, নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে বাংলা লোকসাহিত্যচর্চা প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে। গ্রামীণ জনসমাজের সমাজ ও সংস্কৃতির আবহমান ধারার স্বরূপ উন্মোচনে অন্যান্য সহায়ক উৎসের সাথে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে লোকসাহিত্য একটি নির্ভরযোগ্য উৎসরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় গুরুত্ব বহন করে। এমতাবস্থায়

লোকসাহিত্যের প্রতি ফোকলোরবিদদের পাশাপাশি ইতিহাস গবেষকদেরও গভীরভাবে দৃষ্টিনিবন্ধ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

উৎস হিসেবে বাংলা লোকসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা

লোকসাহিত্য যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনধারা এবং চিরায়ত সমাজের চরিত্র চিত্রণে গবেষককে তাৎপর্যপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি প্রদানে ভূমিকা রাখে তেমনি ইতিহাসের অন্যান্য উৎসের মতো এর সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রও নেহাৎ কম নয়। প্রথমত, সাহিত্য হচ্ছে মানব মনের কল্পনা ও ভাবালুতার এক শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ। এখানে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে বাস্তব-অবাস্তব কল্পনা, অতিকথন, ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসপ্রবণতার মিশ্রণ ঘটে। দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যের মৌখিক মাধ্যমে প্রবাহমানতার কারণে এর পরিবর্তন-পরিমার্জন ঘটে এবং অঞ্চলভেদে এর বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়ত, সংগ্রাহকের সংগ্রহের সময়ও এর বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য সংগ্রাহক কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'পরিচয়-নির্মাণের' লক্ষ্যে অথবা অসাবধানতাবসত সংগ্রহকৃত নিদর্শনে তার ভাব–মতাদর্শের প্রবেশ ঘটে, ফলে লোকসমাজের জীবনঘনিষ্ঠ রূপের ব্যত্যয় ঘটে যায়। চতুর্থত, রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের তথ্য এখানে প্রায় অনুপস্থিত। পঞ্চমত, লোকসাহিত্য লোকসমাজের আবহমান কালের সৃষ্টি এবং একটি দীর্ঘদিনের চলমান ধারার ফল। তাই লোকসাহিত্যের অধিকাংশ সৃষ্টিরই সময়কাল অজ্ঞাত। ফলে এর মাধ্যমে ইতিহাস গবেষণার একটি অন্যতম অপরিহার্য অনুষঙ্গ 'কালানুক্রম' (Chronology) নির্দিষ্টভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঘটনা বা তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতাও থাকে না।

লোকসাহিত্য অবলম্বনে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একজন ইতিহাস গবেষককে উপর্যুক্ত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে সেক্ষেত্রে গবেষকের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ, তদসংক্রান্ত অন্যান্য সহায়ক উৎস দ্বারা সমর্থন প্রভৃতি সাপেক্ষে উৎস হিসেবে লোকসাহিত্যের সীমাবদ্ধতাগুলোর অধিকাংশই কাটিয়ে তোলা সম্ভব।

উপসংহার

গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং বিচিত্র কর্মবহুল অতীত সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গমের জন্য বাংলা লোকসাহিত্য তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। বিশেষ করে প্রাক-আধুনিক এবং প্রাক-শিল্পায়নের বাঙালি সমাজের বিবিধ চিত্র পরিলক্ষিত হয় লোকসমাজে আবহমান কাল জুড়ে প্রচলিত গান, গল্প, গীতিনাট্য, লোককাহিনি, প্রবাদ এবং মৌখিক ঐতিহ্যে যা গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এসকল সাহিত্যিক রূপ সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা, দারিদ্র্য সহ নানা প্রতিবন্ধকতার সাথে টিকে থাকার সংগ্রাম, অবসর-বিনোদন এবং লোক-মনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে, যা তৃণমূল স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে (History from below) ইতিহাসকে বোঝার জন্য ইতিহাস গবেষককে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়ে

থাকে। তবে উৎস হিসেবে লোকসাহিত্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদকে কতিপয় ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন: বস্তুনিষ্ঠতার অপ্রতুলতা, অতিরঞ্জন ও অতিকথন, নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা সমষ্টিগত পক্ষপাত, 'রোমান্টিকতাপূর্ণ অতীত' (Romanticised past)[৭৭] এর ভাবপ্রবণতা প্রভৃতি সীমাবদ্ধতা লোকসাহিত্যকে ইতিহাসের একটি অকাট্য সূত্র হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লোকসাহিত্যের মৌখিকভাবে প্রবহমানতার ফলে সময়ের সাথে সাথে এগুলোতে বর্ণনার পরিবর্তন, রূপান্তর, সংযোজন, বিয়োজন প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। অধিকন্তু লোকসাহিত্যসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অতীত সম্পর্কে একটি সাধারণীকৃত ধারণা প্রদান করে। তবে একজন গবেষকের সতর্কতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা এবং বিবিধ সহায়ক উৎস দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে রূপক-অতিরঞ্জন-অতিকথন থেকে অতীত জনমানসের জীবনালেখ্য পৃথক করার মাধ্যমে পূর্বোক্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে কতিপয় সীমাবদ্ধতা এবং সেগুলো যথাযথভাবে উত্তরণ সাপেক্ষে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতিহাসচর্চায় লোকসাহিত্য অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি সহায়ক উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যোগ্যতা রাখে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ W. Gordon East, *The Geography Behind History*, (London: Thomas Nelson and Sons, 1st published:1938), 136-152.

২ আলোচ্য প্রবন্ধে 'বাংলা' বলতে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বেষ্টিত ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বাংলা অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বাংলা ভাষাভাষী। মুঘল শাসনামলে এটি সুবাহ বাংলা এবং ১৯৪৭ সনের পূর্বে ব্রিটিশ বেঙ্গল বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত ছিল বর্তমানে যা মোটামুটিভাবে বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুরো অংশ এবং আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের কিয়দংশের মধ্যে বিভাজ্য। তবে প্রবন্ধে বাংলার পূর্বাংশকে (বর্তমান বাংলাদেশ) বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ), ৬৭-৭৩।

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), ২৮।

৫ Regina Bendix, "The Uses of Disciplinary History," *Radical History Review*, Issue 84 (Fall 2002): 111.

৬ Johann Gottfried Herder, *Ideas for the Philosophy of the History of Mankind*, (Princeton: Princeton University Press, Princeton ed. 2024), 225-249; Brigitte R. Barger, *The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World*, (Urbana: University of Illinois Press, 2004),

10-30; Virginia Rounding, *Catherine the Great: Love, Sex, and Power,* (New York: St. Martin's Press, 2006), 185-210; Tim Blanning, *Frederick the Great: King of Prussia,* (New York: Viking Press, 2002), 90-110.

৭ George Abraham Grierson, *Linguistic Survey of India,* in 11 volumes, (Calcutta: Government Press, 1894- 1928); *The Songs of Manik Chandra Rajan,* (Calcutta: The Baptist Mission Press, 1878).

৮ W. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal,* (New York: Leypoldt and Holt, 1868).

৯ Edward Tuite Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal,* (Calcutta: Government Press, 1872).

১০ James Wise, *Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal*, (London: Harrison and Sons, 1883).

১১ William Crooke, *The Popular Religion and Folklore of Northern India,* (Westminister: Archibald Constable & co., 1896).

১২ উদাহরণস্বরূপ উইলিয়াম ক্রুক এর *The Folklore of India* (1896), *The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh* (1896); রেভারেন্ড জেমস লং এর *Bengali Proverbs* (1868); এডওয়ার্ড কলিন্স এর *The Folk-Lore of the Santal Parganas* (1872); রিচার্ড টেম্পল এর *The Legends of the Bengali People* (1887); রেভারেন্ড লাল বিহারী দে'র *Folk-Tales of Bengal* (1883) প্রভৃতি ফোকলোর সংক্রান্ত গ্রন্থ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসকদের সরকারি ছাপাখানা 'The Government Press' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩ আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতির সন্ধানে*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২), ৫০-৫১।

১৪ *প্রাগুক্ত*, ৫১.

১৫ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, ১২।

১৬ Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh: Exploration into Dynamics of a Hidden Nation*, (Dhaka: UPL, 1996), 146-147.

১৭ উদাহরণস্বরূপ ডেভিড ফিশার এর *Albion's Seed: Four British Folkways in America* (1989); বার্নার্ড বেইলিন এর *The Ideological Origins of the American Revolution* (1967); অ্যালান টেলর এর *American Colonies* (2001); জন ফ্রাঙ্কলিন জেমসন এর *The American Revolution Considered as a Social Movement* (1926); রিচার্ড ডরসন এর *American Folklore* (1972) প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাসবিদগণ তাদের স্ব স্ব বিষয় বিশ্লেষণে অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি লোকসাহিত্য ও লোক ঐতিহ্যকেও ব্যবহার করেছেন।

১৮ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে জ্যাকব গ্রিম এর *Deutsche Mythologie* (1835); ফার্নান্ড ব্রুডেল এর *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* (1949); মিখাইল বাখতিন এর *Rabelais and His World* (1965) এবং বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন এর *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983) গ্রন্থ প্রণিধানযোগ্য।

১৯ ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫), ২৮।

২০ Francis Lee Utley, "The Study of Folk Literature: Its Scope and Use," *The Journal of American Folklore,* Vol.71, No. 280 (April-June 1958): 139.

২১ মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন*, (ঢাকা: অবসর, ২০১২), ২৪।

২২ আবদুল হাফিজ, "বাংলাদেশের সাহিত্য: লোকসাহিত্য," *বাংলাদেশের সাহিত্য*, সংকলন উপবিভাগ কর্তৃক সংকলিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), ১২১।

২৩ J A Bourdillon, *Report on the Census of Bengal 1881,* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1883) ,190.

২৪ *Bangladesh Population and Housing Census 2011: Socio-Economic and Demographic Report*, National Report: Vol. IV, pub. by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2015, 180.

২৫ *Population and Housing Census 2022, National Report: Vol. I,* pub. by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), 2023, 72.

২৬ আবদুল হাফিজ, "বাংলাদেশের সাহিত্য: লোকসাহিত্য," ১২১।

২৭ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ২।

২৮ মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), *লোকসঙ্গীত*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), মুখবন্ধ।

২৯ অমর পাল ও দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), *বাঙলার লোকসঙ্গীত*, (কলকাতা: পাঁচালি প্রকাশন, ১৯৪৮), vii ।

৩০ উদ্ধৃত, অমর পাল ও দুলাল চৌধুরী (সম্পা.), *বাঙলার লোকসঙ্গীত*, ১১৯।

৩১ Shibli Chowdhury, *Folk Songs from Feminist Perspective,* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2021), 25.

৩২ উদ্ধৃত, মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), *লোকসঙ্গীত*, ২৫২।

৩৩ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ৪।

৩৪ সৈয়দ আজিজুল হক, *ময়মনসিংহের গীতিকা: জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য*, (ঢাকা: অবসর, ১৯৯০), ১।

৩৫ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ৬।

৩৬ আবদুল হাফিজ, 'বাংলাদেশের সাহিত্য: লোকসাহিত্য', *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ১৩০।

৩৭ উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*, ১২৯।

৩৮ ওয়াকিল আহমদ, *মৈমনসিংহ গীতিকা*, https://bn.banglapedia.org/index.php?title=মৈমনসিংহ গীতিকা, retrieved November 01, 2024

৩৯ Akbar Ali Khan, *Discovery of Bangladesh*, 147.

৪০ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ১০।

৪১ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (সম্পা.), *খুকুমণির ছড়া*, ১২-১৩।

৪২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৫৭), ১১৫।

৪৩ মুহম্মদ এনামুল হক, 'লোক-সাহিত্য', *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য: ১ম খণ্ড*, শামসুজ্জামান খান সম্পা.,(কলকাতা: র‌্যাডিকাল, ১৯৯৮), ৭।

৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, ৪৫।

৪৫ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, ১০৯; বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, (কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০), ৭৭-৭৮।

৪৬ মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, *দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য: গাজীরগান*, (ঢাকা: সমাচার, ২০১৪), ১১।

৪৭ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ৭১।

৪৮ *প্রাগুক্ত*, ৫৯-৬০।

৪৯ *প্রাগুক্ত*, ৫৯।

৫০ মাযহারুল ইসলাম তরু, *বরেন্দ্র অঞ্চলের লোকসঙ্গীত: আলকাপ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), ১৫৩-১৫৪।

৫১ অজিতকুমার মিত্র, "মন্ত্রচর্চা ও লৌকিক বিশ্বাস," *সমকালীন*, ভাদ্র-১৩৮৩ সংখ্যা (সেপ্টে. ১৯৭৬): ২০১।

৫২ ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা লোকসাহিত্য: মন্ত্র*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০), ১১-১২।

৫৩ Maria Edward Leach (ed.), *The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Vol. I, (New York: Funk & Wagnalls, 1972), 760.

৫৪ ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলা লোকসাহিত্য: মন্ত্র*, ২৩-২৮।

৫৫ উদ্ধৃত, ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ১৬।

৫৬ অজিতকুমার মিত্র, "মন্ত্রচর্চা ও লৌকিক বিশ্বাস," ২০২।

৫৭ ওয়াকিল আহমেদ (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতি*, ১৭।

৫৮ Maria Edward Leach (ed.), *The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*, Vol. I, 938.

৫৯ শীলা বসাক, *বাংলা ধাঁধা: বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০), ২৬৮।

৬০ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৫৭), ৪৪৮।

৬১ *প্রাগুক্ত*, ৪৪৭-৪৪৯।

৬২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রবাদ, (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭১), ২৬।

৬৩ আবদুল হাফিজ, "বাংলাদেশের সাহিত্য: লোকসাহিত্য," ১২১।

৬৪ Wolfgang Mieder, *"Proverbs Speak Louder Than Words": Folk Wisdom in Art, Culture, Folklore, History, Literature, and Mass Media,* (New York: Peter Lang Publishing, 2008), 22.

৬৫ উদ্ধৃত, বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৯৯৯), ২৫।

৬৬ Mary Lefkowitz, "Historiography and Myth," In *A Companion to the Philosophy of History and Historiography*, ed. Aviezer Tucker (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2009), 355.

৬৭ *Ibid*, 356.

৬৮ *The history of oral history,* https://www.ohs.org.uk/about-2/#:~:text=Oral history, retrieved November 05, 2024.

৬৯ Michael Bentley, *The History of Historiography: The Historical Method*, (London: Routledge, 1997), 18-43.

৭০ *The history of oral history,* https://www.ohs.org.uk/about-2/#:~:text=Oral history, retrieved November 05, 2024.

৭১ Peter Burke, "History and Folklore: A Historiographical Survey," *Folklore,* Vol. 115, no. 2 (2004): 133–39. http://www.jstor.org/stable/30035163

৭২ *History from below*, https://archives.history.ac.uk/makinghistory/themes/ history_from_below.html, retrieved November 05, 2024

৭৩ Tony K. Stewart, *Needle at the Bottom of the Sea: Bengali Tales from the Land of the Eighteen Tides,* (California: University of California Press, 2023), 6-8.

৭৪ মোস্তফা তারিকুল আহসান, *বাংলাদেশের ফোকলোর: তত্ত্ব ও অধ্যয়ন*, (ঢাকা: য়ারোরা বুক কর্নার, ২০২০), ১৫৯।

৭৫ বিস্তারিত, রওশন জাহিদ, *বাংলাদেশের লোকজ জ্ঞান ও খাদ্য নিরাপত্তা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০২২)।

৭৬ মোস্তফা তারিকুল আহসান, *বাংলাদেশের ফোকলোর*, ১০৪।

৭৭ Eric Hobsbawm and Terence Ranger (ed.), *The Invention of Tradition,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 63-95; Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,* (London: Verso, 1983), 173-196.